ব্যবধান

আব্দুর রহমান আবিদ

খুব ছোটবেলার কথা। সবেমাত্র স্কুলে যাওয়া ধরেছি। স্কুলে তখনও কারো সাথে তেমন একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। দু'এক জনের সাথে কেবল মুখচেনা হয়ে উঠেছি। আমাদের বাসাটা ছিল শহরের অনেকটা মাঝামাঝি জায়গায়। আশপাশে বাড়ীঘরের তুলনায় দোকানপাট আর মার্কেটই ছিল বেশী। কাছাকাছি বয়েসী কোন ভাইবোনও ছিলনা খেলার মত। কাজেই ঘরে এবং ঘরের বাইরে আমার একমাত্র বন্ধু আর খেলার সাথী ছিল জামিরুল, আমাদের বাসার কাজের বুয়ার ছেলেটা। জামিরুল ছিল আমারই বয়েসী। আমরা দু'জন ছিলাম খুব ভাল বন্ধু। আমাদের সম্পর্কটাও ছিল 'তুই-তুই'। আমার কখনও মনে হয়নি জামিরুল আমাদের বাসার কাজের বুয়ার ছেলে, কখনও মনে হয়নি সামাজিকভাবে জামিরুল আর আমার মধ্যে অনেক ব্যবধান। আর তাই জামিরুলের প্রতি মা বা বড়ভাইদের আচরনে মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগতো আমার।

একবার মনে আছে, আমার নতুন কেনা ছোট সাইকেলটা নিয়ে আমি আর জামিরুল খেলতে গেছি আমাদের বাসার কাছের এক ষ্টেডিয়ামের মাঠে। জামিরুল চালাচ্ছে আর আমি ঠেলছি। সাইকেল চালানোয় ওর হাত ছিল আমার চেয়ে খানিকটা কাঁচা। ষ্টেডিয়ামের দেয়াল ঘেঁষে যাওয়ার সময় আমি একটু মজা করার জন্যে জোরে ঠেলা দিই সাইকেলে । তখন ভাবিনি ব্যাপারটা এরকম সাংঘাতিক কিছু হয়ে যাবে। ধাক্কায় ব্যালান্স রাখতে পারেনা জামিরুল। সাইকেলটা খুব জোরে গিয়ে ধাক্কা খায় পাশের দেয়ালে। ছিটকে পড়ে জামিরুল সাইকেল থেকে। বেশ কয়েক জায়গায় ছঁড়ে যায় ওর শরীরের; রক্তও বেরিয়ে আসে দু'এক জায়গা থেকে। আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে তুলে ধরে দাঁড় করাই। ভীষন অপরাধী মনে হয় নিজেকে। অথচ জামিরুল কেন জানি একটুও রাগেনা আমার উপর। আমাকে তিরস্কারও করে না। তাই দেখে আমার কি যে খারাপ লাগে জামিরুলের জন্যে! এত মায়া হয় ওর জন্যে যে আমি কেঁদে ফেলি।

বাসায় ফেরার পথে জামিরুল কেন জানি খুব মন খারাপ করে থাকে। তার চোখেমুখে একধরনের ভীতিও লক্ষ্য করি আমি। ষ্টেডিয়ামের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে সাইকেলের সামনের চাকাটা অনেকখানি বেঁকে গেছে, স্পোকও ভেঙেছে কয়েকটা। নতুন সাইকেল। কাজেই বাসায় ফিরে আমি আর জামিরুল যে নির্ঘাত বড় ধরনের বকা খাবো আজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জামিরুলের তো কোন দোষ নেই। দূর্ঘটনার সময় সাইকেল সে চালালেও দূর্ঘটনাটা ঘটেছে তো আমার কারনেই। কাজেই বাসায় ফিরে যা বলবার আমিই বলবো। কেউ বকা দিলে আমাকেই দেবে, জামিরুলকে নিশ্চয় নয়। আমি অভয় দিই তাকে। কিন্তু তারপরও জামিরুল কেন জানি নিশ্চিন্ত হতে পারেনা; সারাটা পথ কোন এক অজানা ভয়ে মনমরা হয়ে থাকে সে।

জামিরুল যে ভয়টা পাচ্ছিল, বাসায় ফিরে ঠিক সেটাই ঘটে। সাইকেলের জন্যে বড় ভাইয়া আমাকে এক চোট বকাঝকা করার পর জামিরুলকে ধরে পেটান। আর পুরো সময়টা আমি পাগলের মত চেঁচাতে থাকি জামিরুলের নির্দোষিতার কথা বলে। এরপর অনেকদিন পর্যন্ত জামিরুলকে খুব লজ্জা পেতাম আমি। এড়িয়ে চলতাম ওকে। তারপর আবার একসময় মিল হয়ে যায় আমাদের এবং আশ্চর্য্য, জামিরুল কোনদিন একবারের জন্যেও সাইকেল নিয়ে মার খাওয়া প্রসঙ্গে আমাকে কিছু বলেনি।

সকালে স্কুলে যাবার আগে আমি যখন ডাইনিং টেবিলে বসে ডিম পোচ আর গরম পরোটা দিয়ে নাস্তা করতাম, তখন ঘরের এককোনে মেঝেতে বসে রাতের পান্তা ভাতে ডাল, মরিচ মেখে অবলীলায় খেয়ে উঠতো জামিরুল। আমার খুব ইচ্ছে করতো জামিরুলকে ডেকে আমার পাশে এনে বসাই, আমার ডিম পোচটা ওর সাথে ভাগাভাগি করে খাই। একদিন বলেও ছিলাম মা'কে। মা এমন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকালেন যেন এ জীবনে এমন অসম্ভব কথা এর আগে তিনি কখনও শোনেননি। তারপর আমাকে এমন জোরে একটা তাড়া মারলেন যে, এর পরে এমন ভাবনা আমি আর মনেও আনিনি।

মনে আছে, ওরা মা-ছেলে রাতে আমাদের ষ্টোররুমের মেঝেতে ঘুমাতো। ওদের মশারীটা ছিল একেবারে ছেঁড়া। সারারাত মশা কামড়াতো ওদের। অথচ আমাদের বাসায় এক্সট্রা মশারীই ছিল চার, পাঁচটা। বাসায় মেহমান এলে কেবল তখনই ওগুলো বের করা হতো। এছাড়া অন্য সময় ওগুলো এমনিই পড়ে থাকতো আলমারীতে। আমার কতদিন ইচ্ছে হতো মা'কে বলি ওদেরকে ভাল একটা মশারী দিয়ে দিতে। কিন্তু মা'কে সে কথা বলতে কখনই সাহস হয়নি আমার।

বেশ ক'বছর আগে। তখন ক্যাডেট কলেজে পড়ি। এস এস সি পরীক্ষার পর ছুটিতে বাড়ী এসেছি। কোন এক বিকেলে এক রিকশার গ্যারেজের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই জামিরুলের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। দেখি গায়ে একগাদা কালি মেখে একমনে রিকশা সারার কাজ করছে সে। খুব খুশী হয়ে উঠি আমি জামিরুলকে দেখে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করি। কোথায় থাকে ওরা, ও আরও কিছু করে কিনা, ও'র মা মানে আমাদের সেই বুয়া তখনও কোন বাসায় কাজ করেন কিনা,... এই সব আর কি। একসময় আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, আমি যথারীতি ওকে 'তুই' করে বললেও সে কিন্তু আমাকে তুই বা তুমি কোনটাই বলছেনা। কেমন যেন একটা ইন্ডিরেক্ট ভাষায় কথা বলছে। 'কবে আসা হলো', 'কেমন থাকা হয়', 'কবে আবার ফিরে যাওয়া হবে', ... এই জাতীয় কথাবার্তা। আমি অবাক হয়ে কারন জিজ্ঞেস করলে খুব লজ্জা পায় জামিরুল। কেন জানি আলাপটা এরপর খুব বেশীদূর আর গড়ায়না।

বছর খানেক আগে। বুয়েট তখন বন্ধ। ছুটিতে বাড়ী এসেছি। কোন এক বিকেলে বাসার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি রিকশার অপেক্ষায়। দূর থেকে একটা খালি রিকশা আসতে দেখে আমি হাত তুলে ডাকি। রিকশাটা কাছাকাছি এসে থামতেই ঝটপট উঠে পড়ি আমি রিকশায়। খেয়াল করিনা রিকশাওয়ালাকে। কেউই বোধহয় করেনা। খুব কাছ থেকে নীচু গলায় কে যেন বলে ওঠে, "ভাল আছেন আবিদ ভাই?" চমকে উঠি আমি। ঝট করে তাকাই রিকশাওয়ালার মুখের দিকে - জামিরুল। চলতে শুরু করে রিকশা। আমার এক সময়ের খুব কাছের মানুষ, আমার খেলার সাথী, যাকে ছাড়া এক সময় আমার একটা দিনও চলতো না, সেই জামিরুল মাথা নীচু করে একমনে রিকশা চালাতে থাকে। আর জ্বলন্ত 'ফাইভ ফাইভ' হাতে রিকশায় বসে থাকি আমি। খুব বেশী কথা হয়না আমাদের। যাওবা হয়, তাতে সম্বোধনের কোন দ্বিধাদন্দ্ব থাকেনা। খুব পরিস্কার পার্থক্য হয়ে যায় - 'তুই' আর 'আপনি'।

ড্রইং রুমের সোফায় আধশোয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছি। ছুটিতে বাসায় এলে সকালে নাস্তার পর করার তেমন কিছুই থাকেনা। খুব অলস সময় কাটে। গল্প, উপন্যাস বা ম্যাগাজিনের পাতাতেই ডুবে থাকতে হয় সারাদিন। আজও সেরকম একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসেছি। লক্ষ্য করি, একটু দূরে কার্পেটের উপর বসে একগাদা খেলনা নিয়ে খেলছে আমার বড় ভায়ের ছেলে শোভন। সাথে বাসার কাজের মেয়ের ছেলেটা। শোভনের বয়স সাড়ে চারের মত। স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি এখনও। বাসায়ই

এ-বি-সি-ডি পড়ে। বয়সের তুলনায় ওর হাইট এবং স্বাস্থ্য দু'টোই ভাল। কাজের মেয়ের ছেলেটার বয়স শোভনের কাছাকাছিই। কাঠির মত শরীরে বড়শড় পেটটা কেমন বেঢপ দেখায়। আমি খেয়াল করি ওদের। দু'জনই খেলার ভেতর দারুন ডুবে আছে। এ একটা খেলনা গাড়ী জোরে ঠেলে দিচ্ছে ও'র দিকে, ও আবার সেটাকে ধরে ঠেলে ফিরিয়ে দিচ্ছে এ'র দিকে। দারুন মজা পাচ্ছে দু'জন। একটুতেই হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ও'র গায়ে। কি অদ্ভুত মিল দু'জনের!

একমসয় দু'জনকেই কাছে ডাকি আমি। শোভন এক দৌড়ে আমার কোলে এসে বসে। আর ছেলেটা কাছাকাছি এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি শোভনের নরম বাচ্চা গালে আদর দিয়ে বলি, ''বাবা তুমি বড় হয়ে কি হবে?'' একটু চিন্তা করে শোভন। তারপর হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, ''আমি বড় হয়ে পাইলট হবো চাচু; ভুম...ভুম.... করে প্লেন চালাবো আকাশে।'' আমি এবার ছেলেটার দিকে তাকাই। ও'র ফুলে থাকা পেটে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে জিজ্ঞেস করি, ''কি রে, তুই বড় হয়ে কি হবি?'' ছেলেটা অবাক চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে আমার দিকে। চেয়েই থাকে। বড় হলে কি হতে হয়, কিম্বা কি হওয়া যায় সম্ভবত জানা নেই ও'র।।

[গল্পটি যখন লিখি, তখন আমি বুয়েটের ৩য় বা ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। সেসময় শফিক রেহমানের 'মৌচাকে ঢিল' নামের পত্রিকাটিতে আমার এই গল্পটি ছাপা হয়েছিল। 'মৌচাকে ঢিল' এর ঐ সংখ্যার প্রচ্ছদও করা হয়েছিল আমার এই গল্পটির অবলম্বনে। শফিক রেহমান সাহেব আমার গল্পটি নিয়ে ছোট্ট একটি সম্পাদকীয় নোটও দিয়েছিলেন ভেতরের পাতায়। আমার লেখালেখির জীবনে এই গল্পটি স্মৃতিবহুল লেখাগুলির একটি]